১২.৭.১ বাংলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন

ভারত ছাড়ো আন্দোলন বা '৪২-এর আন্দোলনের অন্যতম উত্তাল কেন্দ্র ছিল বাংলা। বোম্বাই, আমেদাবাদ, পাটনার মতো কলকাতা ও ঢাকা শহরে আন্দোলনের প্রথম ধাক্কা লাগে। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে তমলুক, কাঁথি, মালদহ, যশোহর, বরিশাল, নদিয়া প্রভৃতি মফস্‌সল শহরে। ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে বাংলায় যে আন্দোলন শুরু হয়, তার মধ্যে মেদিনীপুর জেলার জনগণের অংশগ্রহণ শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, কালানুক্রমের বিচারে চট্টগ্রাম বিপ্লবের পরে হলেও লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যধারার প্রেক্ষিতে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূত্রেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার গণ-অভ্যুত্থান সর্বপ্রধান হিংসাত্মক বিদ্রোহ বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য। চট্টগ্রাম বিপ্লব ছিল একটি শহরে কিছুদিনের জন্য সরকারি শাসন অকেজো করে রাখার লক্ষ্যে একদল জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী তরুণের সংগ্রাম। কিন্তু ১৯৪২-এ মেদিনীপুরে ঘটেছিল গণবিদ্রোহ। সারা জেলার সকল শ্রেণির নারী-পুরুষ যুবা এই বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। এক সরকারি প্রতিবেদন থেকে মেদিনীপুরে '৪২-এর বিদ্রোহের গভীরতা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মেদিনীপুরের বিদ্রোহী জনতা একটি প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর মতোই নিজেদের সংগঠন, কর্মসূচি, নেতৃত্ব ইত্যাদি পরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করতেন। বিপক্ষবাহিনীর গোপন সংবাদ সংগ্রহ, যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করা, সমরকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের সচেতন পূর্ব-পরিকল্পনা করা থাকত।

তমলুক মহকুমায় ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উত্তাল কেন্দ্র ছিল তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম। বিদ্রোহীরা একসভায় স্থির করেন (২৪ সেপ্টেম্বর) যে, একসঙ্গে থানা, আদালত ও কয়েকটি সরকারি দপ্তর আক্রমণ করা হবে। এজন্য 'বিদ্যুৎবাহিনী' নামে স্বেচ্ছাসেবীবাহিনী গঠন করা হয়। জেলা সদর থেকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২৮ তারিখ রাতে বড়ো বড়ো গাছ কেটে রাস্তাগুলির উপর ফেলে রাখা হয়। ৩০ টি রাস্তার উপরে থাকা ছোটো ছোটো সেতু (কালভার্ট)

ভেঙ্গে দেওয়া হয়। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া হয়। প্রায় ১৯৪টি টেলিগ্রাফের খুঁটি উপড়ে ফেলা হয়। পূর্ব পরিকল্পনামত প্রায় ২০ হাজার স্বেচ্ছাসেবী পাঁচটি পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ চালান (২৯ আগস্ট)। খেজুরি, পটাশপুর, সুতাহাটা থানা বিদ্রোহীরা দখল করে নেন। কিন্তু তমলুক, মহিষাদল, ভগবানপুর থানা দখল করতে গিয়ে বহু আন্দোলনকারী শহিদ হন।

তমলুক থানা দখলের সময় অপূর্ব দেশভক্তি ও সাহস দেখান আন্দোলনকারী জনতা। নির্ভয়ে ব্রিটিশ পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দেন। অসীম বীরত্ব দেখান গ্রাম্য গৃহবধূ ৭০ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা। পুলিশের হুমকি অগ্রাহ্য করে তিনি জাতীয় পতাকা হাতে তমলুক থানা ও মহকুমাশাসকের দপ্তরের দিকে এগোতে থাকলে সেনা ও পুলিশ তাঁর হাতে গুলি করে। সেই অবস্থাতেই তিনি জাতীয় পতাকা তুলে ধরে দেশীয় সেনাদের ইংরেজের চাকুরি ছেড়ে আসার আহ্বান জানান। এই সময় দ্বিতীয় গুলি এসে তাঁর কপালে বিদ্ধ হয়। বন্দেমাতরম্ বলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরার সাহস ও আত্মত্যাগের ঘটনা সারা দেশে '৪২-এর বিপ্লবীদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। সুতাহাটায় সামরিক পোশাকে সজ্জিত 'বিদ্যুৎবাহিনী' ও 'ভগিনী সেনাশিবির' (নারীবাহিনী) পরিচালিত বিশাল জনতা থানা দখল করে আগুনে ভস্মীভূত করেন। মহিষাদল থানাতেও বিক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা সমবেত হয়ে স্বাধীনতার প্রস্তাব পাঠ করেন। দেশীয় সিপাহিরা আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করতে অস্বীকার করেন। তবে রাজার দেহরক্ষীরা মহিষাদল থানা রক্ষা করে। এই মহিষাদলেই প্রথম 'বিদ্যুৎ বাহিনী' নামে সেনাদল গঠিত হয়। ভগবানপুর থানা দখলের অভিযানে নেতৃত্ব দেন হৃষীকেশ গায়েন। এখানে পুলিশের গুলিতে ১৭ জন শহিদ হন। নন্দীগ্রাম থানা দখল করতে গিয়ে শহিদ হয়েছিলেন পাঁচজন। ১৯৪২-এর অক্টোবরের মধ্যে সুতাহাটা, পটাশপুর, খেজুরি থানা এলাকা আন্দোলনকারীদের হাতে চলে যায়। বাংলার গভর্নর হার্বার্ট গোটা পরিস্থিতিকে বিপ্লবের সমতুল্য অভিহিত করে উপযুক্ত প্রতিরোধ অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের দাবি তোলেন।

কাঁথি মহকুমাতে প্রায় ৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবক দলে দলে ভাগ হয়ে প্রতিটি ইউনিয়নে দপ্তর স্থাপন করেন এবং গ্রামে গ্রামে আন্দোলন সংগঠিত করেন। ছাত্র, শিক্ষক, সরকারি কর্মী, আইনজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ আন্দোলনে যোগ দেন। স্কুল, কলেজ, সরকারি দপ্তর, আদালত, দোকান, বাজার সব অচল হয়ে থাকে। পিছাবনী গ্রামে পুলিশ ১১ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করলে, বিশাল জনতা পুলিশকে ঘেরাও করে রাখে। তাদের দাবি ছিল, সহকর্মীদের মুক্তি না দিলে আমরা 'পিছাবনী' অর্থাৎ পিছিয়ে যাব না। এই স্লোগান থেকে গ্রামটির নাম 'পিছাবনী' হয়েছে বলে নরেন সেন লিখেছেন। পুলিশ আটক ১১ জনকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় (২০ সেপ্টেম্বর)। একই দিনে পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকদের একটি শিবির আক্রমণ করে অত্যাচার চালায় এবং ৪০ জনকে গ্রেপ্তার

করে। মহকুমা হাকিম আটকে রাখা ১১ জনকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েও কথার খেলাপ করলে বিদ্রোহীরা হাকিমের লঞ্চ ও নৌকা ডুবিয়ে দেয়। পুলিশ প্রতি-আক্রমণ ও নির্বিচার অত্যাচার চালায়, আন্দোলনকারীরাও থানা, ডাকঘর, টোলঅফিস আক্রমণ ও ধ্বংস করে প্রত্যুত্তর দেন। অক্টোবরের শুরু থেকেই সেনাবাহিনী গ্রামে গ্রামে গিয়ে নির্যাতন চালাতে শুরু করে। গ্রামবাসীর টাকা-পয়সা, সোনাদানা লুঠ, ঘর-বাড়ি ধ্বংস করা, বেত্রাঘাত, নারীধর্ষণ ইত্যাদি চালিয়ে ব্রিটিশ সেনা আন্দোলনকারীদের উপর প্রতিশোধ নিতে থাকে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ইংরেজের অত্যাচারকে অষ্টাদশ শতকের মারাঠা বর্গির আক্রমণের থেকেও নৃশংস বলে অভিহিত করেছেন।

উত্তরপ্রদেশের বালিয়া এবং মহারারাষ্ট্রের সাতারা-এর মতো মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমাতেও 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। ১৬ অক্টোবরে প্রচণ্ড ঝড় ও বন্যা মেদিনীপুরের গ্রামজীবনকে বিধ্বস্ত করেছিল। তা সত্ত্বেও বিদ্রোহের বিশিষ্ট নেতা অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়ে দেন (২৫ অক্টোবর) যে, কোনো কারণেই আন্দোলন স্তিমিত হতে দেওয়া হবে না। এর কিছুদিন পরেই 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' গঠনের ঘোষণা করে (১৭ ডিসেম্বর, ১৯৪২ খ্রি.) '৪২-এর বিপ্লবীরা ব্রিটিশ প্রশাসনের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক হন সতীশচন্দ্র সামন্ত। অর্থসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব হন, যথাক্রমে অজয় মুখোপাধ্যায় ও সুশীলকুমার ধাড়া। ইতিপূর্বে গড়ে তোলা 'বিদ্যুৎবাহিনী' জাতীয় সেনাদল বলে গণ্য হয়। পরে একটি গেরিলাবাহিনী ও নারীসেনাদল বিদ্যুৎবাহিনীর সাথে যুক্ত করা হয়। জাতীয় সরকার নানা স্থানে নিজস্ব জেলা ও থানা গড়ে তোলে। জাতীয় সরকার অর্থ সংগ্রহের জন্য জমিদারের ধান লুঠ, জোতদারদের কাছে জরিমানা আদায়, অপহরণ করে অর্থ আদায়, ডাকাতি ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করে। জাতীয় সরকার ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্তদের নানাভাবে সাহায্য করে। বিচার, আইনশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি নানা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে প্রশাসন সক্রিয় রাখার চেষ্টা চালায়। সরকার অবশ্যই এই ব্যবস্থা মেনে নেয়নি। পুলিশ ও সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে আন্দোলনকারীদের নানাভাবে নির্যাতন চালানো হয়। তা সত্ত্বেও ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার টিকেছিল। জাতীয় সরকারকে নানাভাবে শক্তি জোগায় কমিউনিস্টরা। মুসলমানরাও নানাক্ষেত্রে জাতীয় সরকারের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন বলে সরকারি প্রতিবেদনে জানা যায় (Fortnighty Report, 2 September/1 November, 1942)। মার্চ মাস নাগাদ বিক্ষোভের ঢেউ কিছুটা নিস্তেজ হয়ে যায়। মে মাসে সতীশ সামন্ত বন্দি হলে অজয় মুখোপাধ্যায় সর্বাধিনায়ক হন। সেপ্টেম্বরে তাঁকেও কারারুদ্ধ করা হয়। অতঃপর বিদ্যুৎ-বাহিনীর প্রধান সুশীলকুমার ধাড়া আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যান। শেষপর্যন্ত গান্ধির আহ্বানে 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' নিজের অস্তিত্বের অবসান ঘোষণা করে (১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ খ্রি.)।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে কলকাতা ও সন্নিহিত এলাকাগুলিতেও '৪২-এর আন্দোলন ব্যাপক আকার নেয়। কলকাতায় স্কুল, কলেজ, পরিবহন স্তব্ধ করে হরতাল পালিত হয়। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সংযোগবাহী তার ও খুঁটি উপড়ে ফেলা হয়। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সংগঠিত মিছিলে হাজার হাজার মানুষ 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' ধ্বনি দিতে শহর পরিক্রমা করে। সরকারি নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে দৈনিক পত্রিকাগুলির প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঢাকা, বগুড়া, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, যশোহর প্রভৃতি পূর্ব বাংলার শহরগুলিতেও আন্দোলন দানা বাঁধে। হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় আগস্ট আন্দোলনে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ঘটে। বোলপুরে সাঁওতাল উপজাতি ও মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। জনতার আক্রমণে রেল স্টেশন, ডাকঘর, কাছারি, বিভিন্ন সরকারি অফিস ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুলিশ নির্মম অত্যাচার চালিয়ে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। সত্ত্বেও প্রায় দু'সপ্তাহ জনতার অভ্যুত্থান অব্যাহত ছিল।

ড. সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, ১৯৪২ সাল বাংলার ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমী বছর। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত কংগ্রেসের দুর্বল নেতৃত্ব জনগণকে সংগঠিত করার কাজে বিশেষ ভূমিকা না-নিলেও, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। আন্দোলন শুরুর প্রাক্কালে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের জনভিত্তি অনেকটাই শিথিল ছিল। বরং '৪২-এর অভ্যুত্থানের সূত্রে কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যসংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল। মহম্মদ খয়রুল আলম-এর গবেষণার ভিত্তিতে ড. ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে, বাংলাতেও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিল খুব কম। মুর্শিদাবাদের মতো মুসলিম অধ্যুষিত জেলাতেও বন্দি হওয়া স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে মুসলিম ছিলেন মাত্র দুই শতাংশ। এটি ছিল জাতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক প্রবণতার অন্যতম পরিণতি।